# দুটো সংস্কৃতির সন্ধিক্ষণে প্রবাসে প্রজন্মরা

(এটি নিউইয়র্ক ভিত্তিক ঠিকানা এবং লন্ডন ভিত্তিক বাংলা এক্সপ্রেসএ এসেছে)

নাজমা মোস্তফা

তারিখটা ২০০২সালের জুলাইএর মাঝামাঝি কোন একটি দিন। গরমের প্রচন্ড প্রভাব সর্বত্রই যদিও ঘরে ঘরেই এয়ার কন্ডিশনের ধকলে তাও ওতো বুঝার উপায় নেই। কিন্তু এ সময়টাতে রাত্রে বাইরে যথেষ্ট সহনশীল আবহাওয়া বললেও ভুল হবে না, মনে হয় বেশ আরামেরই মৃদুমন্দ বাতাসের বহুল্যতাও আছে। রাত দুপুর। গভীর ঘুমেই শুনতে পাচ্ছিলাম যেন এক দঙ্গাল লোকেদের চিল্লাফাল্লা। বহুক্ষণ এ অত্যাচারের আওয়াজে গভীর ঘুম ভাঙ্গো আবার ঘুম ধরে এভাবেই এক সময় বাধ্য হলাম জানালা দিয়ে উঁকি দিতে। পাঁচ তলার উপরে মানে ছয় তলার একদম লাগোয়া চত্বরে মাত্র ৬/৭ মাস আগে গড়ে উঠা পার্কটি একদম আমারই দেয়াল ঘেষা। আর সেই পার্কে আগত সদস্যদের, বাচচাদের বুড়োদের, সমাজচিত্র অতি অল্প সময়ের মধ্যে আঁচ করার জন্য এটাও আমার মত নতুনদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সুযোগ বটে। অবাক বিস্ময়ে ওদের অনেক নতুনত্ব আমাকে হজম করতে হয়।

আমাদের বাংলাদেশের পার্কগুলিতে বর্তমান সময়কার ধারণায় দেখেছি এখানে থাকে যত সব অসামাজিক কাজের আখড়া। এখানের পার্কগুলি তাদের অসামাজিক নয়, সামাজিক চিত্রই ফুটিয়ে তোলার জন্য উত্তম আখড়া। তবে হ্যাঁ গভীর নিশিথেও এদেশে অনেকেই ঘুরে বেড়ায়। হয়তো অসামাজিক কাজে এখানেও অনেকেই জড়াতে পারে তবে সামাজিক দ্বায়িত্ব পালনের জন্যও রাত্রের ডিউটির জন্য অনেককে রাত দুপুরেও ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়। তাই দু একজনা সমানেই রাস্তায় চলাচল করতে দেখা যায়। তবে আমি এসব চিত্র ব্যস্ত নিউইয়র্ক শহরের কথাই বলছি।

গভীর নিশিথের ক্লান্তির প্রহর কাটিয়ে ঘুম ভাঙ্গা চোখে চেয়ে দেখি সেখানে দেখা যাচেছ মাত্র একজোড়া সদস্য এক পুরুষ ও একটি মহিলাই, ছেলেটার গায়ে একটা গেঞ্জি একটা ছোট হাফপ্যান্ট। আর মেয়েটা প্রায় উলঙ্গ গরমে একটা নিমা জাতীয় কিছু একটা ও একটা হাফপ্যান্ট পরে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে মেয়েটা চিৎকার দিচিছল এবং সমানেই কিছু প্রশ্ন করে যাচিছল সঙ্গের ছেলেটিকে। ইংরেজী হোয়াই, হোয়াই কথাটাই শুধু আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ছয় তলার জানালাতে আছড়ে পড়ছিল। তবে বুঝা যাচিছল প্রেম সম্বন্ধীয় কোন গ্যাঞ্জামের ধারাবাহিকতা ছিল এই চিৎকারের উৎস। পাশেই বাচচাদের খেলার মাঠ। ওখানে একটি সাইকেল নিয়ে এক অন্ধকার জায়গায় বসেছিল এক ছেলে, আবছা দেখা যাচিছল, মনে হয় তাদেরই ছেলে হবে। অনেকক্ষণ পর দেখি সেও চিৎকার দিয়ে উঠে। ডেডি, ডেডি করে সে ডাকছিল। প্রায় এক ঘন্টা আধা ঘন্টা দেখতে থাকি তাদের বাক বিতন্ডা, বিতন্ডার মাত্রাটা এত উচচ গ্রামে ছিল যে কথাগুলো বারে বারেই প্রতিধ্বনিত হচিছল চার পাশের সব ক'টি দেয়ালে। আইনের দেশ, সভ্যতার দেশ, সমতার দেশ, সমৃদ্ধির দেশ এসব এখানের সামাজিক অস্থিরতার এক অতি স্বাভাবিক দৃশ্য যা অনেক সময় রাস্তাঘাটে তেমন না দেখলেও তাদের টিভি শো গুলোই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ, উদাহরণ। তাদের সামাজিক সব অনাচার ধারণ করার জন্য তাদের অনেকগুলি চ্যানেলে অনেকগুলি শো'ই সমাজ চিত্র জীবন্ত করে তুলে ধরার জন্যই যথেষ্ট। এমন সব অনাচার তারা করে আমরা জীবনে দেখি তো নিই শুনিও নি। কখনো মা-ছেলে- বাপ-বেটি-ছেলে বউ-মেয়ে জামাই- শ্বশুর শ্বাশুড়ী সব একাকার কে যে কার বুঝাই ভার। যেন সত্যিকার এক কুকুর মেলা। এসব চিত্র না দেখলে আমরা হয়তো অনেকেই এতো সহজে ধরতে পারতাম না তাদের ফাঁকটুকুন। সব সময়ই আমাদের অন্যের প্রতি একটা অহেতুক উচচ ধারণা মন থেকেই আসে । আমরা নিজেরাই মনে করি আমরা জাতি হিসাবে একদম জিরো একটা কিছু।

আমাদের গৃহে দেখতে পাই বেশীরভাগ স্ত্রীরা উদ্বিগ্ন স্বামীর চিন্তায়, সন্তানের চিন্তায়, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মঙ্গলাকাঙখায় উন্মুখ থাকেন। বহু যুগ পূর্ব গত স্বামীর জন্য নারীকেও আফসোস করতে দেখেছি। দুর দেশে পড়ে থাকা স্বামীর জন্য কত ব্যাকুলতা, স্ত্রীর চিন্তায় স্বামীর ব্যাকুলতা এ এক সহজ বাস্তবতা। আর এখানের প্রাচুর্যের সন্তানেরা এসবের ধার ধারেন না, পরোয়াও করেন না কারণ স্বামীরা, বয়ফ্রেন্ডরা, স্ত্রীরা, গার্লফ্রেন্ডরা শতে শতে গড়াগড়ি যাচেছ কোন কিছুর অভাব নেই। অবাধ প্রাচুর্যের দেশে সব কিছুই সুলভ। শুধু চারিত্রিক, আত্মীক সততা, এসবের একটু জটিলতা, দুস্প্রাপ্যতা এই যা।

এখানের সমাজে মা বাবার কোন কর্তৃত্ব সন্তানের উপর খাটে না, দরকারও তেমন নেই কারণ এখানের সরকার এতই সচছল যে সে-ই সন্তানের অনেক দ্বায়িত্ব, চাকুরী, সুযোগ সুবিধা দিতে সক্ষম। কিন্তু দায়িত্বশীল বাপ মায়ের দ্বায়িত্ব কোন দিনই একটি প্রচন্ড শক্তিশালী সরকারের পক্ষেও মেটানো সম্ভব নয়। এখানেই বুঝি বিধে আছে তাদের অনেক বড় ব্যর্থতা। মা বাবার অনেক দ্বায়িত্ব সরকার তুলে নিয়েছে। তাই লাগামহীন জীবনের লাগামের রশি সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে না পারাতেই তাদের প্রাচুর্যের সন্তানদের এমনতরো পাপের পদচর্চা সমাজে সভ্যতায় সর্বত্র। সাক্ষাৎ মানুষ গড তার মৃত্যুর মরিচিকা কাটিয়ে কত আর পথ দেখাতে সক্ষম? আদৌ যদি তারা সর্ব শক্তিমান ঈশ্বরের দোয়ারে সঠিক ধর্ণা দিত, তার ভীতি অন্তরে ধারণ করতো প্রতিটি সুকর্ম কুকর্ম চিহ্নিত করে তার জবাবাদিহিতার সঠিক ধারণা রাখতো তবে তাদের এতো বখে যাবার কথা ছিল না।

চার্চগুলো সমানেই ধর্মের ডাক দিচেছ তবুও যেন ধর্মের সুবাক্য সুকথা কাউকে কাছে টানে না। সাময়িক এক মোহে তারা মাথা দোলায় ঠিকই কিন্তু গোজামেলে কথা মাথার ভিতর কঠিন অবস্থান নিতে বারে বারেই ব্যর্থ হয়। এখানে ছেলে মেয়ে দু ধরণেরই প্রস্টিটিউট আছে। সমকামিতার এক স্বর্গভূমি এই আমেরিকা। অতীত সমাজে ধ্বসে যাওয়া লুত নবীর সময়কালীন সভ্যতার মত এখানের সভ্যতাও ধ্বসে পড়তে পারে যে কোন মহুর্তে। আর সেই আতঙ্কও যে কোন সচেতনের মনে জাগতেও পারে। আর সেই ধ্বংস স্তুপ থেকে সর্ব যুগেই কিছুরা উদ্ধার পেতেও পারে। কারণ স্রষ্টা দ্ব্যর্ধহীনভাবে বলে চলেছে প্রতি সম্প্রদায়ই তার সীমালংঘনকারী গুণের জন্য যুগে যুগে ধ্বসে গেছে। সীমালংঘন মানে কি? যেখানে আদর্শ চিহ্নিত করা আছে সেই আদর্শের চলার সীমারেখা যদি কেউ ডিঙ্গায় তবেই সে চিহ্নিত হবে অনাচারী হয়ে নয়তো সৎকর্মে পরস্পরকে প্রতিযোগীতা করতেই উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

আজ যদি প্রতিটি জাতি প্রতিটি গোষ্ঠী প্রতিটি ধর্মগ্রন্থের মুল্যায়ন করতো, একের প্রতি অন্যেরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতো, প্রয়োজনে প্রতি ধর্ম জেনে নেবার পড়ে নেবার ক্ষমতা এ সমাজের মানুষের অবশ্যই ছিল। প্রতিটি ধর্ম নাড়লেও সে অবশ্যই সঠিকের খোঁজ পেত। আর প্রত্যেকে যদি যুক্তি দিয়ে নিজের ধর্মটাকেও যাচাই করেন তাতেও সত্য সবার চোখেই ধরা পড়ার কথা। মিথ্যাটাও বুঝে নেবার কথাও ছিল কারণ চোখ, কান, বিবেক, বাকসত্বা এসব গুণে ধন্য আমরা।

তাদের এমন সব টিভি শো আছে যেখানে নারীগুলো শত শত জনতার সামনে গায়ের ১০০% কাপড় খুলে আনন্দ নৃত্য করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করে। হয়তো কোন বিবেচক দর্শক মাঝে মাঝে লজ্জার ভানও করেন। এই তাদের আনন্দের জীবন, সমতার জীবন, স্বাধীনতার জীবন। যার হাতছানিতে আমাদের তসলিমারা দিশাগ্রস্থ হয়ে সমাজকে এরকম এক আনন্দ ধারায় যোগ দিতে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন।

পোষাকের প্রতি যেন নারীদের অনীহা অতিরিক্ত। যত সল্প ড্রেস হবে ততই যেন ফ্যাশন বাড়তি। ন্যাংটা থাকাটাই একটি বাড়তি ফ্যাশন তাদের । তাদের শোতে দেখা যায় উশৃংখল উলঙ্গা নারীটাকে ঘরে তোলার জন্য সার্ট পেন্ট পরা সুদর্শণ ছেলেটা যখন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তার পায়ের কাছে মাথা নিয়ে বলে “আই লাভ ইউ”। যে কোন সচেতনের ঘেন্নায় মাথা ঘুরে যাবে। কিন্তু তাদের পুরুষটি একি করলো একটি স্ট্রিপার বেশ্যা মেয়ের জন্য যে তার এই স্বামীকে করতে হলো। এরকম ঘটনা তাদের দুজনার বেলায়ই হয়। এক সময় দেখা যায় একটি মেয়েও এমনি মাথা নোয়ায়। তারপরও তারা কেমন করে বলে “আই লাভ ইউ”। লাভ লোকসানের কিছু এরা বুঝে বলেও তো মনে হয় না। ভালবাসার কাছে তারা কত যে হতভাগা এসব তাদের করুণ চিত্র তাদের আচার আচরণেই ফুটে যত্রতত্র।

এরা সেক্স আর কুকর্মের পিছনে তারা তাদের যত মেধা ঢালে এবং এ করেই তারা সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ প্রাচুর্যতায় থেকেও নিকৃষ্ট জীবের আচরন ধারণে উৎকৃষ্ট হয়। তারা একে অন্যকে ডগ, বিচ ডাকতেই দক্ষ। অনেক বাচচাদের স্কুলের টিচারের কাছে শুনেছি কত গালাগালি অশ্লীলতা যে একটা বাচচাও জানে তা বলার মত না কারণ তারা সেই ট্রেনিংই পাচেছ ঘরে বারান্দায়, পার্কে। তাই অভিবাবকেরা তাদের বাচচাদের স্কুলে দিতেও সব সময় সতর্ক থাকেন যাতে খারাপ স্কুলের পরিবেশের খপ্পর থেকেও বাচচাদের যতটুক সম্ভব বাঁচোনো যায়।

একদিন ভর দুপুরে দেখি ঐ পার্কে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে সিক্স-সেভেন-এইটের এরকম বয়সের দুটি ছেলে মেয়ে পার্কে গড়াগড়ি দিচেছ এবং তাদের কুকুরমেলা চালিয়ে যাচেছ ঠিক সেই সময়টিতে স্কুলের বাচচা কয়জনা আসে দোলনা চড়বে কিন্তু চোখের সামনে এ দৃশ্য দেখে তারা চুপিসারে অন্যদিকে চলে যায়। গুরুজন আপা ভাইয়াকে আর বিরক্ত না করে তারা অন্য দিকে যায় অন্য খেলা খেলতে। এই যে শিক্ষা তাতো তারা শিখছে দৃশ্যের বাস্তবতা দেখে দেখে।

পাশাপাশি এতসব নোংরামি দেখে দেখে অনেক মা বাবা দেখেছি তাদের ৩/৪ বছরের শিশু বাচচাটাকে পর্যন্ত মাথায় কাপড় তুলে দিয়েছে। সেটাও আরেক অবাস্তব বাস্তবতা। তাদের এসব সেক্সি শো এতো বেশী হয় এবং অবশ্যই এসব তাদের বাচচারাও দেখে এটাতে তাদের সমস্যা বাড়ার বৈ কমার কিছু দেখি না। তাদের উৎসাহ, উদ্যোক্তা, পরিচালক, দর্শক সবাই উৎসুক তাদের এলিমিডেট, ব্লাইন্ডডেইট এসব নিয়ে। তাদের এসবে অতি উৎসাহ যদি নাই থাকতো তবে এসব অনুষ্ঠানের এত ছড়াছড়ি কেন?

সম্প্রতি লন্ডন থেকে প্রকাশিত ১৬ই জুলাই ২০০২ সালের সাপ্তাহিক বাংলা এক্সপ্রেসে মিনাহ ফারাহ এর লেখা “প্রবাসে জন জেনীর পৃথিবীতে বাংলিশ ক্রাইসিস” বলে নতুন প্রজন্মের উপর লেখাটি পড়লাম। সম্ভবত পরবর্তিতে উনার লেখাটি এখানের ঠিকানায়ও এসেছে। উনার লেখাতে হতাশার সাথে মোকাবেলারত প্রজন্মের চিত্র লেখিকা তুলে ধরেছেন শুধু একজন লেখিকা হিসাবেই নয় একজন ভোক্তরভাগী হিসাবেও।

মুলতঃ লেখিকার লেখার সুত্র ধরেই আমিও এখানে দুকথা বলতে চাচিছ। এই যে কঠিন কষ্টের প্রহর কাটছে এখানের বিগত কালে আসা আমাদের অনেককেই বা এখনো যারা আসছে তাদেরকেও দুটি কালচারের সাথে মোকাবেলা করতে হচেছ। বেশীর ভাগেরই এদেশে আসার কারণ জীবনের নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা ও সুযোগ সুবিধা। এখানের অনেকেই এমনও আছেন যে এখানে না

আসলে তারা কোন ঝামেলায়ই পড়তেন না। ওখানেও যথেষ্ট স্বচছল ওরা থেকেছেন। এ ধরণের সদস্যরাই বরং আসছেন বেশী। প্রথমতঃ এসব কারণেই জনতারা এদেশে ভিড় জমাচেছ ক্ষুদ্র একটি দেশ বাংলাদেশ যেন ঠাই নাই ঠাই নাই অবস্থা। এবার আসল প্রসঙ্গটিতে আসি এখানের যে গড়ে উঠা সভ্যতা এটি অতি সাম্প্রতিক কালের অধুনিকায়নের মোকাবেলারত, যার অতীত ইহিতাস প্রায় নেই বললেই চলে। এ ইতিহাস মাত্র দু'শ বছরের পুরানো। এখানের যে কালচার এটা কালচারের দিকে অতি নিম্ন রুচির, নিম্ন ধারার একটি কালচার। পক্ষান্তরে, যে কালচার আমরা সেই হত দরিদ্র দেশটিতে ফেলে এসেছি ওটা অনেক সমৃদ্ধগুণে ধন্য, আভিজাত্যপুর্ণ ও প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক। সে হিসাবে আমার প্রজন্মকে আজ উৎকৃষ্ট থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে নিকৃষ্টের মাঝে সম্পুর্ণভাবে ফেলে দেয়া আমাদের জন্য বা প্রজন্মের জন্য কারো জন্যই কিন্তু সঠিক নয়।

আমাদের কালচার, আচার আচরণের দিকগুলো এতো সমৃদ্ধ এতো সুন্দর যে তাকে খুবই সুস্পষ্টভাবেই ফুটিয়ে তুলতে হবে প্রতিটি প্রজন্মের কাছে। আর শুধু বাংলাদেশের সংস্কৃতিই না, মনে করেন আমরা যারা মুসলিম তাদের হাতে অতি সাম্প্রতিক চৌদ্দশ' বছরের ধর্মের দিক দিয়ে সবচেয়ে আধুনিক আদর্শনামা তো আছেই। তার আগেও ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে তা নাহয় বাদই দিলাম আর ওটাকে প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য শুধু রবীন্দ্র সংগীত ও উল্টা বই মুখস্থ করার বাইরেও আমাদের অনেক কিছু করার আছে। যেমন মনে করুন যখন সে স্কুলে যে ভাষাটি শিখেছে ঐ ভাষাতেও সে তার আদর্শ গ্রন্থটির থেকে তার মুল্যবান বাণী আহরণ করতে পারে অনায়াসেই। আর যদি একটি বাড়তি ভাষা হিসাবে কিছু অরবী শেখা যায় এটাতে বাড়াবাড়ি না করে তাদেরও শেখানো যায় আমরাও শত অসহযোগী সমাজের ঝামেলার মাঝেও এসবের অনেক কিছুই শিখেছি। আর সুরাগুলি সব সময়ই অর্থপাঠের মাঝে বুঝে পড়া উচিত। এতে এর দুর্বোধ্যতা কাটে। এ সব দেশে তো সব সময়ই একটি বাড়তি ভাষা শেখার উপরও জোর দেয়া হয় এবং কুরআনের ছন্দবদ্ধতা এতই সুললিত যে এটা যেকোন শিশুই নামাজের জন্য অতি অল্পেই আয়ত্ব করতে পারে। এটা অবশ্যই কঠিন এমন কিছু একটা না।

আর ঐ যৌবনের রং মহলে যেসব নাটক ঘটছে তা দেখেই যে তাকে উৎকৃষ্ট রাস্তা ছেড়ে নিকৃষ্টের দলে যোগ দিতে হবে কেন? তার হাতে উৎকৃষ্ট জিনিসটা আছে। ওদের হাতে তো ওটা নেই, ওদের হাতে যদি এটা থাকতো তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চমক তারাই দেখাতো। তাদের ধর্ম গ্রন্থ বনাম বাইবেলের যে দশা করে রেখেছে তারা, তবুও শাস্ত্রকারদের ওটা নিয়ে কতই না রবিবাসরীয় প্রোগ্রাম। কথায় কথায় ক্রুশ আর চার্চ, গড আর ব্লেসিং। সে হিসাবে এরাও কিন্তু নাস্তিক জাতি নয়। যথেষ্ট আস্তিকতা তাদের মধ্যেও আছে। নিজেদের মনগড়া কিছু কথা ঢুকিয়ে তাদের স্বার্থবাদীরাই গ্রন্থকে হালকা করে রেখেছে নয়তো তাদের গ্রন্থও হতো যথেষ্ট দিকদর্শক।

আর কালচারের এই সংগ্রাম শুধু এখানের প্রজন্মকেই করতে হচেছ সেটাও সঠিক না। সমস্ত বিশ্বপাড়ায় আজ এক হজবজ অবস্থা শুরু হয়ে গেছে। আমাদের বাংলাদেশের প্রজন্মরাও কি খুব সুখে আছে? সেখানেও কি অভিবাবকেরা নাকানি চুবানি খাচেছন না? সবাই কি তার সব শালিনতা বজায় রেখে ওখানেও চলতে পারছে। ডিশের বাতাস কি সব দুয়ারেই আছড়ে পড়ছে না? প্রজন্মের দ্বন্ধ কি ওখানেও শুরু হয় নি? সময়ে সময়ে অপসংস্কৃতির বন্যায় তারাও কি ভেসে যাচেছ না? ওখানের বিপদ আরো বেশী এখানে বলার ফুরসত আছে যে তারা ভিন্ন সংস্কৃতির ধারক কিন্তু ওখানে কি বলবেন সেটুকু বলারও তো ফুরসত নেই। ওখানেও অনেক অভিবাবকের চোখে ঘুম নেই, অশান্তিও অপসংস্কৃতির নানান হাতছানি তাদেরেও নিয়ত মোকাবেলা করতে হচেছ। ইসলামী সংস্কৃতির সহজ

সাধারণ বাস্তবতা আজ অনেকের কাছে লজ্জার বিষয়, গেয়োপনা মনে হয়। এর প্রধান কারণ নিজের স্বসংস্কৃতি চিনতে ব্যর্থ হওয়া। এ ব্যর্থতা শুধু আটলান্টিকের পাড়েই এসে আছড়ে পড়ে নি, এ ব্যর্থতা আজ বাংলাদেশের বঙ্গোপোসাগরের বেলাভূমিতেও চিড় ধরাচেছ।

এখানের প্রজন্মকে উৎকৃষ্ট মানুষের মর্যাদা অর্জন করে বাঁচতে হলে তাকে অবশ্যই "সোনার বাংলা" গানটি গাওয়ার কোন দরকার নেই। "গড ব্লেস অমেরিকা মাই হোম সুইট হোম" অবশ্যই সে গাইবে এবং দরদ দিয়েই গাইবে। তাদের দু"শ বছরের যা উৎকৃষ্ট তা অবশ্যই সে গ্রহণ করে ধন্য হবে। তবে যে বর্বরতা, যে নগন্যতা, যে তুচছতা, যে নোংরামী তাকে চিহ্নিত করে বাঁচতে হবে একারণেই যে অতি বড় এক সভ্যতা সংস্কৃকির ধারক সে এবং তার পুর্বপুরুষেরা।

টেলিফোনে হ্যালোর বদলে স্লামালাইকুম বলতে এরা কেন তিনবার পিছলে পড়বে? তার মা-বাবা-ভাই-বোনকে-আপনজনকে সে এটা বলতে তারা কেন হুচট খাবে। এটা একটা দোয়া একের জন্য অন্যের এক উত্তম চাওয়া যা আমরা আমাদের প্রতিটি সহযোগীদের জন্য চেয়ে থাকি। তবে সে হুচট সে অবশ্যই তখনই খাবে যখন এসবের সাথে একদম অপরিচিত থাকবে। এসব একটি পরিবারের অতি সাধারণ একটি আচার যা শিশুকাল থেকেই এটার সাথে দেখে শুনে সবাই অভ্যস্ত। হতে পারি এদেশে আমরা ধাক্কার সম্মুখিন হয়েছি কিন্তু আমাদেরও কি ভাই বন্ধু নেই যে তাদের সাথেও কি আমরা আমাদের সহজ সিগ্ধ আচরণ করি না? সত্যিকারভাবে এসবের পরিচিতিও তুলে ধরার দ্বায়িত্বও পরিবারের, অভিবাবকদের একারণে যে সেও যেন তার পরবর্তীদের জন্য সুন্দরটুকুন তুলে রাখতে পারে।

এলটন জনের "ক্যান্ডল ইন দা উইন্ড" আজ শুধু এখানের শিশুরাই শুনছে না, এ গান আজ বাংলাদেশের আকাশ বাতাসও মথিত করছে। ওখানেও উর্দুকে তাড়াতে পারলেও এখন হিন্দি গানের রমরমা ব্যবসা। ব্যস্ত ব্যান্ডের গানে মুখরিত প্রতিটি অলিগলি। সবকিছুকেই তো আর অস্বীকার করা যায় না। তাই বলে রবীন্দ্রসংগীত যদি সে না বুঝে তাতে সে ডুবে যাবে না, আত্মা হারিয়ে বসবে না।

সে তখনই তার সত্তা হারিয়ে ফেলবে যখন দু'শ'বছরের এদোডোবায় গে, লাসবিয়ান, বাইসেক্স্যুয়েল, ফ্রি মিক্সিং এসবকে সে তার নিজের মত করে গ্রহণ করবে। আত্মবিক্রেতার নাম লিষ্টে তার তখনই উঠবে আর এর মাত্রাটি ঠিক রাখতে হলে সেই গ্রন্থের কাছে যাওয়া ছাড়া আমাদের দ্বিতীয় আর কোন পথ খোলা নেই। মনে রাখতে হবে একটি মাত্র গ্রন্থ যেটি স্রষ্টার নির্দেশ নিয়ে আগত। আস্তিকের দেশ এই আমেরিকা, এখানে সঠিক আস্তিকতা বজায় রাখার এটাই উত্তম রাস্তা।

পোষাক বলতে গেলে শুধু মেয়েদের কথাই বলতে হয় কারণ পুরুষরা পোষাকের অধঃপাতের মাত্রাটা মনে হয় এখানেও মেয়েদের মত এত মাত্রাটা নামায় নাই। প্রায়ই দেখা যায় একটা পুরুষ সার্ট প্যান্ট পরে আছে কিন্তু তাদের পাশের নারীটি উলঙ্গাপ্রায়। এ উলঙ্গাপণার মাঝে যদি আমাদের প্রজন্মেরও তীব্র আকর্ষণ ঘটে এর প্রভাব পড়ে এটা স্বভাবতই ভাবার বিষয়। যার উপর এর প্রভাব পড়ছে সেকি তার অভিবাবককে বা তার নিকট জনকে এরকম পোষাকে কখনো দেখেছে বা দেখে অভ্যস্ত হয়েছে। যদি কোন অভিবাবক থেকে সে দেখে শেখে তবে তো ভাল কথা তাকে শেখানোও অসম্ভব। আর নয়তো এই অরুচীর এই নোংরামীর বিরুদ্ধেও আমাদের প্রজন্মের মাঝেও একটি ক্ষোভ, একটি প্রতিবাদ,একটি বিপ্লব আসতেই পারে আমার অস্তিত্বকে ভাসিয়ে দিতে নয় আমাকে টিকিয়ে

রাখতে। সে কেন ডুবে যাবে পক্ষান্তরে তার সুন্দরতা, সাবলীলতা আরো অনেকের জন্যই উদাহরণ ও বাঁচার মন্ত্র হতে পারে।

আমি মিনা ফারাহএর কথামতই বলছি এখানে আঠারো পার হওয়া ছেলে মেয়েরা হরমোনের স্বাধীন ব্যবহারে উন্মাদ। হাতে গাড়ির চাবি, পকেটে ডর্মের। সিগারেট আঙ্গুলে, হুইস্কি হাতে। আপনি এ পর্যন্তই বলেছেন। আর ওখানে লন্ডনে এই ঐ দিনকার পত্রিকায়ই দেখলাম বাঙ্গালী কমিউনিটি নেশাক্রান্ত আর এর ছোবল পৃথিবীর অনেক শান্তির দোয়ারেই কড়া নাড়ছে। তাইলে সত্যিকার অর্থে ওদের দলে ভিড়ে যাওয়াই একমাত্র সমাধান নয়? এটা বাঁচার রাস্তা নয়, এটা মরণের রাস্তা। আর এ মরণ জীবন থাকতেই যে মরণ সেই রাস্তা কারণ আমরা কখনোই এ ধারার সদস্য নই আর আমাদের প্রজন্মও এ ধারার সুন্দরতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক তা আমরাও চাই না। আর ঐ আমার প্রজন্মকে ভাল করে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে সেও কখনোই এ ধারা থেকেও বিচ্যুতি চাইবে না।

মিনাহ ফারাহ এর ভাষায় হরমোন ঘটিত মানসিক পরিবর্তনের ধকল সামলাতে শুরু হয় ধর্মের নছিহত। তবে আমার মতে ধর্মের নছিহত এভাবে শুরু করাই বোকার স্বর্গ রচনা করা। এ নছিহতটি শুরু করতে হবে একদম শিশুকালে গল্পে গল্পে কথায় কথায় তার ভিতর এ মূল্যবোধ গড়ে দিতে হবে। কঠিন হরমোন সমস্যায় আক্রান্ত রোগীর জন্য এ মহৌষধ নয় এর প্রতিষেধক দেবার কথা তার অনেক আগেই এটা পুতে দেয়ার কথা তার বিশাল ভুবনের ছোট্ট সেই মনে। এরা যেন কখনোই নিজেদের প্রজন্মকে সঠিক পথটি দেখাবার জন্য কোন উদ্ভট গোষ্ঠীর সৃষ্টি না করে বরং সহজ সাবলিল একটি বস্তুনিষ্ট সত্যতেজী তরুণ গোষ্ঠী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সেই ভবিষ্যত নির্দেশিত উজ্জল সদস্যদেরই দল ভারী করে তোলে।

ওদের অবশ্যই তৈরী করতে হবে শেতাঙ্গাদের পৃথিবীর জন্য যেন ওরা প্রতিপক্ষের সাথে সংগ্রামে টিকে তো থাকবেই শক্ত অবস্থান নিয়ে যাতে টিকতে পারে তারই চেষ্টা করতে হবে। সেই টিকাটা হোক ওদের সাথে ওদের মত হয়ে নয়, নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে নিজের স্বকীয়তা স্বাতন্ত্রতা জীবন্ত করে তুলে ধরে।

ওদের সাথে হাত হাত মিলিয়ে কোকেন, হিরোইন, হুইস্কির বোতল আমাদের কেন তুলে ধরতে হবে। একটার সাথে অন্যটি অতোপ্রোতভাবে জড়িত। আদর্শকে সবাই সমীহ করে। আপনি যখন মদ শুকর স্পর্শ করেন না ওরাই আপনাকে সমীহ করে তারও কারণ অবশ্যই আছে। তাদের শাস্ত্রেও এসব বারণ। অনেক পাদ্রীরা এসব থেকে মুক্ত। তাই সুন্দর সবদিনই সমাদৃত। বাংলাদেশে বাংরেজী, বাংলিশ এর কোন লড়াই নেই সেখানেও চিড় ধরছে সংস্কৃতির নামে ঢুকছে যথেষ্ট অপসংস্কৃতি। যখনই সদস্যরা বিভ্রান্তির রাস্তা ধরবে ঠিক তখনই এ ধারার বিরুদ্ধে বিজয় কেতন উড়াতে হবে সত্যান্বেষীদের।

এ পৃথিবী তো আর সুখের স্বর্গমেলা নয়। এটা এক কঠিন পরীক্ষাগার। নিয়ত আমাদের রেডী করতে হবে প্রতিদিনের প্রেপ শুধু এখানের জন্যই নয় প্রতিটি দিনের হিসাব বুঝে চলতে হবে সঠিক সুনির্দিষ্ট আশান্বিত একটি ফল লাভের জন্য। একটি পরিচছন্ন সুন্দর জীবনই একমাত্র সেই স্বপ্ন সার্থক করতে সক্ষম।

আজ থেকে চৌদ্দশ’ বছর আগে আরবের মরুতে যেখানে উৎকৃষ্ট আদর্শের লালনাগার হয়েছিল সেখানে সেদিনও এরকম অনেক অনাচার কি ছিল না? আর সেটা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতে একটি ব্যক্তির প্রচন্ড আত্মনিবেদন ও প্রচেষ্ঠা কি আজো আমাদের জন্য শিক্ষণীয় নয়? উনি ছিলেন আল্লাহর মনোনিত নবী। যে কেউই বলতে পারেন আমরা তো নবী রসুল কেউ নই। তা নই ঠিক। তবে অত্যন্ত যুক্তির ভিত্তিতে বিজ্ঞানের আলোকে তাকে খুঁজে দেখুন। শ্রেষ্ঠ সিলেবাসটি আমাদের হাতে শুধু মাত্র তার চর্চা, তার প্রচার, তার গ্রহণযোগ্যতার অভাবে অনেককেই দিশাহীন করে তুলছে। যদি আমাদের প্রজন্ম একে সঠিক ভাবে ধরে রাখতে পারে তবে দ্বিতীয় আর কোন ক্রাইসিসের মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা আমাদের থাকার কথা না। তবে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য ধর্মটিকে কয়টি সুরা পাঠের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সার্বিকভাবে এই গ্রন্থটিকে গবেষণা গ্রন্থ হিসাবে নিতে প্রজন্মকে উৎসাহিত করা উচিত।

প্রতিটি মানুষই এক সতন্ত্র সত্ত্বা। “এই মাটিতে জন্ম যেন এই মাটিতে মরি” এই কথার জবাবে বলবো এখানে জন্মি নি বলে মরণে আমাদের কোন ক্ষতি নেই। আমাদের জন্য গোটা বিশ্বই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি, সেহিসাবে গোটা বিশ্বই আমার। আমার পুর্বপুরুষ শুয়ে আছেন ভারতের আনাচে কানাচে। তারো আগে সম্ভবত আমার পুর্ব পুরুষ ইরান তুরান কোথাও থেকে এসে বসতি করেছেন ঐ ভারতের মাটিতে। আমার পুর্ব পুরুষ শুয়ে আছেন বাংলাদেশের সবুজ মাটিতে। আমি সম্ভবত এখানেই শুবো সেটাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর যে কোন জায়গায়ই আমি যাই না কেন আমরা বহু যুগ অবধি আমাদের পুর্ব পুরুষের দেয়া দেয়ালী ঠিক ঠিক ভাবে জ্বালিয়ে রাখতে পেরেছি এতদিন অবদি এটা তো অন্তত স্বীকার্য। এ শুধু আমার একার কারনে নয় এ সম্ভব হয়েছে আমাদের সচেতন পুর্ব পুরুষ এর সমুহ সহযোগীতার কারণেই। তাই সম্মানের ভাগিদার তারাও। আমার স্রষ্টাকে তাই প্রতিটি সত্তা তার নিজের মত করে চিনে নেবে এটাই আমাদের এবং আমাদের প্রজন্মের বেঁচে থাকার একমাত্র মুল মন্ত্র।

সুসংগ্রহ:
আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি লোকদল হওয়া চাই যারা (লোকজনকে) আহবান করবে কল্যাণের (অর্থাৎ কুরআনের, ২ঃ১০৫) প্রতি আর নির্দেশ দেবে ন্যায়পথের, আর নিষেধ করবে অন্যায় থেকে। আর এরা নিজেরাই হচেছ (ইহকালে এবং পরকালে ) সফলকাম।
(সুরা আল-ইমরানের ১০৩ আয়াত।)